বাংলা বানান রীতি ও আমাদের প্রস্তাবনা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

বাংলা বানান রীতি নিয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ গবেষকদের গবেষণা চলমান রয়েছে। আমাদের সামনে ১৯৪৯ সাল থেকে গঠিত বিভিন্ন 'বানান সংস্কার কমিটি'র নমুনা সমূহ রয়েছে। প্রত্যেক কমিটি স্ব স্ব চিন্তা ও রুচি মোতাবেক আরবী-ফার্সী-উর্দূ শব্দাবলীকে বাংলায় সমন্বয় করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। সাথে সাথে বাংলার দেহ থেকে বিদেশী শব্দাবলী ছেঁটে ফেলার কপট উদ্দেশ্যে কিছু ব্যক্তির অপচেষ্টাকে প্রতিহত করেছেন। আমরা তাঁদের শুভ প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই। নিম্নে তাঁদের প্রচেষ্টা সমূহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হ'ল।-

প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা :

বাংলা শব্দ সমূহের প্রতিবর্ণায়নের জন্য বিভিন্ন সময়ে (১৯৪৯-১৯৭৯ খৃ.) বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয়। যেমন-

১। পূর্ববাংলা ভাষা কমিটি (১৯৪৯) :

সভাপতি : মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। সদস্য : ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসাইন (ভিসি, ঢাবি)। মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-বাকী (এম.এল.এ দিনাজপুর)। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (প্রধান, বাংলা বিভাগ, ঢাবি)। আবুল কালাম শামসুদ্দীন (এম.এল.এ ও সম্পাদক, দৈনিক আজাদ)। আদমউদ্দীন (অধ্যাপক, ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, নওগাঁ)। ড. এনামুল হক (প্রধান, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ)। মৌলভী গোলাম মোস্তফা (বি.এ.বি.টি)। আরও তিনজন হিন্দু বিদ্বান সহ মোট ১৯ জন।

২। বাংলা একাডেমী উপসংঘ (১৩৭০ বঙ্গাব্দ/১৯৬৩ খৃ.) :

সভাপতি : সৈয়দ আলী আহসান। সদস্য : ড. শহীদুল্লাহ, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, ফেরদাউস খান, ওসমান গণি, আবুল হাসানাৎ, মুহাম্মাদ আব্দুল হাই, মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (মোট ৯ জন)।

৩। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার কমিটি (১৯৬৭ খৃ.) :

সভাপতি : ড. শহীদুল্লাহ। সদস্য : ড. কাজী দীন মুহম্মদ (পরিচালক, বাংলা একাডেমী), ফেরদাউস খান (পরিচালক, জনশিক্ষা বিভাগ), মুহাম্মদ

আব্দুল হাই (প্রধান, বাংলা বিভাগ, ঢাবি), ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়ন (প্রধান, ইংরেজী বিভাগ, ঢাবি), ওসমান গণি (অধ্যক্ষ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, ঢাকা), আবুল কাশেম (অধ্যক্ষ, বাংলা কলেজ, ঢাকা), ইবরাহীম খাঁ (সাবেক অধ্যক্ষ ও প্রাক্তন এম.এন.এ), ড. এনামুল হক (পরিচালক, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা), মুনীর চৌধুরী (বাংলা বিভাগ, ঢাবি), তফজ্জল হুসয়ন (অধ্যক্ষ, চৌমুহনী কলেজ, নোয়াখালী), মোট ১১ জন। এ কমিটির সুফারিশ বাংলা একাডেমীর সুফারিশের ন্যায় ছিল।

৪। পূর্ব পাকিস্তান স্কুল টেকস্ট বুক বোর্ড (১৯৬৭ খৃ.) :

সভাপতি : এ.এস.এম. মাহমূদ (এম.এ. বি.এল)। সদস্য : ড. শহীদুল্লাহ (প্রফেসর ইমেরিটাস, ঢাবি), ফেরদাউস খান, ড. এনামুল হক, ওসমান গণি, মুহাম্মদ আব্দুল হাই (বাংলা, ঢাবি), সৈয়দ আলী আহসান (প্রধান, বাংলা, চবি), ড. মাযহারুল ইসলাম (প্রধান, বাংলা বিভাগ, রাবি), মুনীর চৌধুরী (ঢাবি), ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (বাংলা বিভাগ, ঢাবি), লুৎফুল হায়দার চৌধুরী (সিনিয়র স্পেশালিস্ট, স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড, ঢাকা), মফীযুদ্দীন আহমদ (স্পেশালিস্ট, স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড, ঢাকা), মোট ১৩ জন। এ কমিটি ৪/৫ বছরের মধ্যে কয়েকবার বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এঁরা প্রথম সুফারিশ-এর পরে ১৯৬৮ সালে দ্বিতীয় সুফারিশ পেশ করেন।

৫। উপরোক্ত সুফারিশ সমূহের একটিও পণ্ডিত মহলে হুবহু গৃহীত হয়নি। সেকথা চিন্তা করে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ১৯৭৮ সালে এ বিষয়ে নতুন পদ্ধতি সহকারে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। পরে ১৯৭৯ সালের অক্টোবরে নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে একটি 'প্রতিবর্ণায়ন কমিটি' গঠন করে।-

(১) ড. কাজী দীন মুহম্মদ (২) মাওলানা আব্দুর রহীম (৩) এ.এফ.এম আবদুল হক ফরিদী (৪) আহমদ হোসাইন (৫) ড. এ.কে.এম আইয়ূব আলী (৬) সানাউল্লাহ নূরী (৭) আখতার ফারূক (৮) মাওলানা মহিউদ্দীন খান (৯) অধ্যাপক শাহেদ আলী। এ ব্যাপারে জনাব ফরিদী ছাহেব অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং পাণ্ডুলিপি পরিশোধন ও পুনর্লিখনের ভার ন্যস্ত হয় অধ্যাপক আ.ত.ম. মুছলেহউদ্দীন ছাহেবের উপর।

নিম্নে বিভিন্ন সময়ে গঠিত পাঁচটি 'প্রতিবর্ণায়ন কমিটি'র সুফারিশ সমূহ প্রদত্ত হ'ল।-

১ম কমিটি, ১৯৪৯ সাল। সভাপতি : মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ।

আরবী হরফ	সরল বাংলা	বিজ্ঞান সম্মত
ث	ছ	থ·
ح	হ	হ·
خ	খ	খ·
ذ	জ	ধ·
ز	জ	জ·
ژ	ঝ	ঝ·
س	ছ	ছ·
ص	ছ	ছ·
ض	জ দ	জ· দ·
ط	ত	ত·
ع	–‘	–‘
ه	হ	

২য় কমিটি : বাংলা একাডেমী উপসংঘ ১৩৭০ বাং/১৯৬৩ ইং। সভাপতি : সৈয়দ আলী আহসান।

ص س ث	স
ض ز ذ	য

৩য় কমিটি : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার কমিটি (১৯৬৭ খৃ.)। ১৯৬৭ সালে ড. শহীদুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে গঠিত ঢাবি সংস্কার কমিটি উপরোক্ত সুফারিশ অক্ষুণ্ন রাখে।

৪র্থ কমিটি : পূর্ব পাকিস্তান স্কুল টেকস্ট বুক বোর্ড (১৯৬৭)।

সভাপতি : এ.এস.এম. মাহমূদ। উক্ত কমিটির দ্বিতীয় দফা সুফারিশ (১৯৬৮)।

ص س ث	ছ স স	ছ স স˙
ظ ض ز ذ	য য য দ য	য য য- দ- য˙

৫ম কমিটি : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ (অক্টোবর ১৯৭৯)।

সম্পাদক : ড. কাজী দীন মুহম্মদ।

ص س ث	ছ˙ স স˙
ظ ض ز ذ	য য দ˙ য- জ˙

এতদ্ব্যতীত ط-ত˙ , غ-গ˙ , ق-ক˙ , وِ -বি˙ । মাদ-এর জন্য া া ইত্যাদি।

বিশেষ নিয়ম (যা সকল কমিটি কর্তৃক গৃহীত) :

আরবী শব্দের যবরযুক্ত অক্ষরের স্বরধ্বনির বাংলা অনুলিখন ‘অ’ অথবা ‘আ’ উভয়টির দ্বারাই চলতে পারে। এর বাঁধাধরা নিয়ম প্রণয়ন করা সুকঠিন। শিষ্ট উচ্চারণের উপরই এবিষয়ে অধিক নির্ভর করতে হবে। তবে যবর সাধারণত ‘অ’-স্বর দিয়ে লিখতে পারা যায়। ...তবে শব্দের প্রথমে ا ع ح ه বর্ণে যবর থাকলে সাধারণত ‘আ’-স্বর দিয়ে লিখতে হবে। যথা : আহমাদ, আমানত, আমল, আরব, হালাল, হারাম ইত্যাদি। তবে ব্যতিক্রম : হজ্জ, হযম ইত্যাদি।

(২) বিখ্যাত নামের বেলায় প্রচলিত বানান বহাল রাখতে হবে। যেমন মিসর, আওরঙ্গযেব, নজরুল ইসলাম প্রভৃতি।

(৩) স্বাভাবিক ধ্বনি প্রবাহের শব্দে মিশে গিয়ে যেসব আরবী-ফার্সী শব্দ বাংলা শব্দে পরিণত হয়েছে, সেগুলি সেভাবেই থাকবে। যেমন পোষাক,

সখ (شوق), হজম, বাজার ইত্যাদি *(গৃহীত : প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা, সম্পাদনা : ড. কাজী দীন মুহম্মদ; ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ (ইফাবা) ১৯৯২, ১৯-১৪২ পৃ. মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৮)* ॥

উপরোক্ত ৫টি কমিটির প্রতিবর্ণায়ন সমূহের প্রদত্ত বিজ্ঞান সম্মত বানানগুলির কোনটিই দেশবাসীর কাছে হুবহু গৃহীত হয়নি। এমনকি ঐসব কমিটির সভাপতি ও সদস্যগণের সাহিত্যকর্মেও উক্ত বানান সমূহ অনুসৃত হয়নি। যদিও ইসলামী বিশ্বকোষে উক্ত বানান রীতি অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু তা সাধারণ লেখক ও পাঠকের নিকট গৃহীত নয়।

বাংলা ভাষার বর্তমান অবস্থা

ফার্সী 'বাঙ্গালাহ' শব্দ দিয়ে এই ভাষার নামকরণ হয়েছে 'বাংলাভাষা'।[১] অথচ সেই বাংলা ভাষাতেই আরবী-ফার্সী-উর্দূ বানানগুলিকে যবেহ করা হয়েছে। আরবী-ফার্সী বানান করা হচ্ছে এখন আরবি-ফার্সি। খোদ 'একাডেমী' বানানকেও 'একাডেমি' বানানো হয়েছে। যুক্তি দেখানো হচ্ছে যে, বাংলা একাডেমী তার বানানবিধিতে সংস্কৃতজাত নয়, এমন শব্দের যেমন : আরবি, ফারসি, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা থেকে আগত শব্দের ক্ষেত্রে দীর্ঘ ঈ-কার ও দীর্ঘ ঊ-কার তুলে দিয়েছে'। অথচ সংস্কৃতজাত শব্দের ক্ষেত্রে সেটি বহাল রেখেছে। আমাদের প্রশ্ন, এই উঠানো ও বহাল রাখার মূলনীতি কি? আরবী-ফার্সীর বানান পাল্টানো হবে, কিন্তু সংস্কৃতজাত শব্দের ক্ষেত্রে বানান বহাল থাকবে কেন? তারা কি তাহ'লে এটা স্বীকার না করে পারবেন যে, বাংলা-র দেহ থেকে আরবী-ফার্সী, উর্দূ-ইংরেজী ছাঁটাই করে তাকে তাদের ধারণামতে বিশুদ্ধ সংস্কৃত বানাতে চান? বাংলাদেশের কয়জন নাগরিক 'সংস্কৃত' বলেন? খোদ বাংলা একাডেমীর পণ্ডিতরা কি সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে পারবেন? তাহ'লে নিজের মায়ের ভাষা ছেড়ে অন্যের অপ্রচলিত ভাষা নিজেদের বানানো অভিধানের মাধ্যমে শুদ্ধ বাংলা (?) বলে চালু করার উদ্দেশ্য কি?

আরেকজন পণ্ডিত লিখেছেন, 'বাংলা বানান শ্রুতি নির্ভর নয়, স্মৃতি নির্ভর'। তাই উচ্চারণের যুক্তি এখানে গৌণ। দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেছেন, সংস্কৃত

১. বাংলা একাডেমী, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান ৮৪৬ পৃ.।

ভাষায় ই এবং ঈ-এর উচ্চারণগত হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা রক্ষিত হয় বলে বানান সেভাবে হয়ে থাকে'। আমরা মনে করি, একই যুক্তিতে বিদেশী শব্দ বিশেষ করে আরবীতে ঈ-কার ব্যবহার করা উচিত। কেননা আরবীতেই এ দু'টির ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। তাহ'লে সেসব শব্দ যখন বাংলায় ব্যবহার করা হয়, তখন সে নিয়ম রক্ষা করা হবে না কেন?

তৃতীয়তঃ তিনি বলেছেন, বিদেশী বানানের ক্ষেত্রে যদিও ই-কার ও ঈ-কার দু'টিই সিদ্ধ, তবুও ভুল এড়ানো ও বানান সরল করার জন্য বর্তমানে এক্ষেত্রে কেবল ই-কার ব্যবহারের বিধি নির্ধারণ করা হয়েছে'। আমরা মনে করি, এর ফলে বিপত্তি আরও বাড়বে। বরং নতুনভাবে অনেক ভুলের বিস্তার ঘটবে। যেমন শত শত বছর ধরে ব্যবহৃত হওয়া ইসলামী, নবী, আলী, শহীদ, গাযী প্রভৃতি শব্দ। অথচ বাংলা একাডেমীর ভাষারীতি অনুযায়ী এগুলির 'শুদ্ধ' রূপ হ'ল ইসলামি, নবি, আলি, শহিদ, গাযি প্রভৃতি।

বাংলা একাডেমীর আরও বেশ কিছু নিয়মের কারণে মুসলমানদের যুগ যুগ ধরে ব্যবহার করে আসা অনেক শব্দের কেবল অপপ্রয়োগই হচ্ছে না, বরং বিকৃতিও ঘটছে। যেমন 'দ্বীন' একটি বহুল প্রচলিত আরবী শব্দ। বাংলা একাডেমীর প্রমিত বানান অনুযায়ী তা লিখতে হয় 'দিন'। অথচ বাংলা ভাষায় আগে থেকে এর অর্থ হ'ল 'দিবস'। অনেকেই লেখেন 'দীন'। যার অর্থ 'দরিদ্র'। এমতাবস্থায় 'দ্বীন' আরবী শব্দটির উপরোক্ত বানানের কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা কাউকে 'দিনের খেদমত কর' বলা হ'লে সে হয়তো ভাববে যে, তাকে রাতের বেলায় চুরি করতে বলা হচ্ছে। আবার 'দীনের খেদমত কর' বলা হ'লে হয়তো সে ভাববে যে, তাকে দরিদ্রদের সেবা করতে বলা হচ্ছে। একই অবস্থা ঘটেছে কুরআন, মুহাম্মাদ, ঈমান, হজ্জ প্রভৃতি বানানের ক্ষেত্রে। এগুলির বাংলা একাডেমীর বানান হবে কোরান, মুহম্মদ, ইমান, হজ। অন্যদিকে 'ঈদ' বানান তারা ঠিক রেখেছেন। অথচ মুসলমানদের জীবনে 'ঈদ' আসে বছরে দু'বার। আর দিনের ২৪ ঘণ্টাই তাদের 'ঈমান' নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়।

বাংলা একাডেমী ও ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের বানান রীতির ক্ষেত্রে আরেকটি মৌলিক পার্থক্য দেখা যায় 'জ' ও 'য' ব্যবহারের ক্ষেত্রে। ইফাবা 'যাল' 'যোয়া' 'যা' প্রভৃতির ক্ষেত্রে 'য' ব্যবহার করে থাকে। এগুলির ব্যবহার

বাংলা ভাষায় অনেক। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বাংলা একাডেমী কয়েকটি বিশেষ ইসলামী শব্দে 'য' ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে। যেমন আযান, ওযু, নামায, মুয়াযযিন, যোহর, রমযান প্রভৃতি।

কিন্তু আগ বাড়িয়ে দৈনিক 'প্রথম আলো' নিয়ম করেছে, বিদেশী শব্দ ও নামের বানানে 'য' না লিখে 'জ' লিখতে হবে। এছাড়া 'প্রথম আলো' গ্রেফতার, রফতানী, দফতর ইত্যাদি ফার্সী শব্দের বানান লেখে গ্রেপ্তার, রপ্তানি, দপ্তর। কেবল তাই নয় সংবিধানের ৬৫ (৩) ধারা অনুযায়ী 'সংসদ সদস্য' বলার নির্দেশনা থাকলেও কলকাতার অনুকরণে তারা লেখেন 'সাংসদ'। অতি সম্প্রতি তারা রুলিং পেয়ে 'সংসদ সদস্য' লিখতে শুরু করেছেন।[২] একইভাবে ঢাকার বাংলায় 'কর্মপরিষদ' বা 'কার্যকরী পরিষদ' চালু থাকলেও কলকাতার অনুকরণে তারা লেখেন 'পর্ষদ'। কলকাতার দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় 'ইতোমধ্যে' শব্দটি অধিক প্রচলিত। কিন্তু ঢাকার বাংলায় 'ইতিমধ্যে' শব্দটি অধিক প্রচলিত। কয়েক বছর আগে দৈনিক প্রথম আলো দৈনিক আনন্দবাজার-এর অনুকরণে লেখা শুরু করল 'ইতোমধ্যে'। যদিও এখন তারা তাদের অনুকরণে মাঝে-মধ্যে 'ইতিমধ্যে' লিখছেন।

বস্তুতঃ বাংলা একাডেমী ও ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের বানান রীতিতে বহু পার্থক্য রয়েছে। যা আমরা ইতিপূর্বে 'প্রতিবর্ণায়ন' অধ্যায়ে বর্ণিত উদাহরণ সমূহে দেখিয়েছি। অথচ দু'টিই সরকারী প্রতিষ্ঠান।

দুঃখের বিষয়, ১৯৭১-এর পট পরিবর্তনের পর মুখোশধারী সেক্যুলাররা বাংলা ভাষাকে আরবী-ফার্সী থেকে ছাঁটাই করার কাজ পূর্ণোদ্যমে শুরু

২. গত ১৯শে মে ২০২২ প্রথম পৃষ্ঠা ৮ম কলাম 'দুঃখ প্রকাশ' শিরোনামে দৈনিক প্রথম আলো লিখেছে, 'কিছুদিন আগপর্যন্ত প্রথম আলো তার প্রতিবেদনসমূহে 'সংসদ সদস্য' শব্দের পরিবর্তে 'সাংসদ' শব্দটি উল্লেখ করে আসছিল। এ বিষয়ে গত ২৭ এপ্রিল 'ল অ্যান্ড লাইফ ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট'-এর লিগ্যাল নোটিশের মাধ্যমে প্রথম আলোর নজরে আনা হয় যে, 'সংসদ সদস্য' শব্দের পরিবর্তে 'সাংসদ' শব্দ ব্যবহার বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় এবং এ বিষয়ে জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকারের রুলিংও আছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম আলো ৯ মে থেকে 'মেম্বার অব পার্লামেন্ট'কে বাংলায় 'সংসদ সদস্য' হিসেবে লিখে আসছে। এর আগে অনিচ্ছাকৃত ভুলবশত 'সাংসদ' শব্দ ব্যবহারের জন্য প্রথম আলো আন্তরিভাবে দুঃখিত' (দৈনিক প্রথম আলো ১৯শে মে ২০২২ প্রথম পৃষ্ঠা ৮ম কলাম 'দুঃখ প্রকাশ' শিরোনাম)।

করেন। তারা সুকৌশলে বাংলা একাডেমীর সরকারী প্রতিষ্ঠানটিকে কব্জায় নেন। বাংলা অভিধান রচনা করে সেখানেও হাত মারার অপচেষ্টা চালান। ফলে বাংলা বানানে বহু পরিবর্তন ঘটে যায়। তখন ইসলামী লেখকরা সরকারী ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের আশ্রয়ে আরবী-ফার্সী সমৃদ্ধ বাংলাকে সুরক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেন। ফলে দু'টি সরকারী প্রতিষ্ঠানের বাংলা বানানে ঘটে যায় ব্যাপক তারতম্য। যা হুঁশিয়ার লেখক ও পাঠকরা সহজে উপলব্ধি করেন। উভয় প্রতিষ্ঠান আজও তাদের স্ব স্ব প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

কোলকাতা কেন্দ্রিক বাংলা ১৯৪৭-এর পূর্বে সংস্কৃত-হিন্দী প্রভাবিত ছিল। ৪৭-এর পর তা এখন হিন্দীর আগ্রাসনে বিপর্যস্ত। ঢাকা কেন্দ্রিক বাংলাই হ'ল বাংলা ভাষার প্রাণ। কিন্তু এখানে বস্তুবাদী ও হিন্দুত্ববাদীদের গোপন হামলায় বাংলা ভাষার বিকৃতি সাধনের অপচেষ্টা রয়েছে। যদিও তা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম পাঠকদের নিকট কদাচিৎ গ্রহণযোগ্য হয়েছে। ফলে অতি বাঙ্গালী ঐ লোকগুলি এদেশে চিহ্নিত হয়ে গেছে। বাংলা একাডেমীর বই মেলায় এদের লেখা বইগুলিই ভিড় জমায়। যদিও রুচিশীল পাঠকদের নিকট এগুলি একেবারেই অপাংক্তেয়।[৩] এবারের (২০২২) একুশের বইমেলা সম্বন্ধে খোদ 'প্রথম আলো'-তেই শিরোনাম হয়েছে, দর্শকের ভিড় আছে, কিন্তু ক্রেতা নেই। বইয়ের চাকচিক্যপূর্ণ কভার আছে, কিন্তু সেগুলি মানহীন।

অন্যদিকে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের বইমেলায় শিরক ও বিদ'আতপন্থী লেখকদের বইয়ের আমদানী বেশী। সেখানকার সরকারী লোকগুলি সরকার ও বিদ'আতী আলেমদের সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে। আহলেহাদীছের কোন লেখা দেখলে তাদের গা জ্বলে। ইফাবা-র বানানরীতিও দুর্বোধ্য এবং একেবারেই অসাবলীল বরং অপাঠ্য। পাকিস্তান আমলের শুরুর দিকে যেমন আরবী হরফে বাংলা লেখার অসাধ্য সাধনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন সে সময়ের প্রশাসন ও ইসলামী সাহিত্যিকরা। বাংলাদেশ আমলের ইসলামী লেখকরাও তেমনি অতি ইসলামী হ'তে গিয়ে বাংলা ভাষাকে অলেখ্য ও অপাঠ্য করে তুলেছেন। ইসলামী বিশ্বকোষের বাংলা

৩. এ বিষয়ে আমাদের সম্পাদকীয় 'বাংলা একাডেমীর বই মেলা' আত-তাহরীক ১৯/৬ সংখ্যা মার্চ ২০১৬ দ্রষ্টব্য।

বানান দেখলেই যেকোন পাঠক এর প্রমাণ পাবেন। আরবী হরফের মাখরাজ ও ছিফাত উচ্চারণযোগ্য। কিন্তু বাংলায় তা যথার্থভাবে সম্ভব নয়। যদিও ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য লেখ্য বাংলায় কিছুটা সম্ভব।

মোটকথা ১৯৪৭-এর পর থেকে সেক্যুলার ও ইসলামী বাংলার মধ্যে নীরব যুদ্ধ চলছে। বিগত এক যুগের অধিককাল ধরে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার ক্ষমতায় (২০০৯ থেকে)। ফলে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে বস্তুবাদীরা মুক্ত বিহঙ্গের মত বাধাহীন গতিতে এগোতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ হাতে গণা কিছু চিহ্নিত ব্যক্তি ছাড়া সাহিত্যের নামে তাদের এসব ফালতু বকওয়াস কেউ গ্রহণ করেনি। ঐসব লোকগুলি কোন সেমিনারে গেলে রুচিশীল লোকেরা সেখানে যান না। আর গেলেও এদের দেখলে চুপচাপ কেটে পড়েন। এমনকি বাংলা একাডেমীর একুশের অনুষ্ঠানে খোদ প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতেও শ্রোতা পাওয়া যায় না। কারণ এসব লেখক ও সাহিত্যিকদের চিন্তার ভাণ্ডার বস্তুবাদের গরল ভেল দিয়ে ভরা। আর এদেশের সংখ্যাগুরু জনগণের চিন্তা-চেতনায় রয়েছে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের দ্যোতনা। ফলে স্রোতের বিপরীত হওয়ায় ঐসব লোকগুলি সরকারের কাছে মেডেলধারী হ'লেও জনগণের কাছে বর্জ্য মাত্র। ওরা মরে গেলেও কেউ *ইন্নালিল্লাহ*... পড়ে না। ঈমানদার কেউ ওদের জানাযায় যায় না। আসমান ও যমীনের কিছুই ওদের জন্য কাঁদেনা।...

আমরা মনে করি, মানুষ তার আক্বীদা-বিশ্বাস যে কথা ও লেখার মাধ্যমে সংযত ও সাবলীলভাবে প্রকাশ করতে পারে, সেটাই হ'ল ভাষা। এক সময় সাধু ভাষার জয়জয়কার ছিল। কিন্তু এখন ওটা প্রায় মৃত। কারণ চলিত ভাষায় মানুষ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। একইভাবে এক সময়ের বহুল প্রচলিত সম্মানসূচক শব্দ শ্রীযুক্ত, শ্রীমান-শ্রীমতি এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। শ্রদ্ধেয় বা জনাব তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। 'খোদা' বা 'স্বয়ম্ভূ' এখন বিদায় হয়ে গেছে। 'আল্লাহ' স্বমহিমায় বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে। এমনকি খৃষ্টানদের অনূদিত বাইবেলেও 'সদাপ্রভূর' বদলে 'আল্লাহ' লেখা হচ্ছে। 'যীশুখ্রীষ্টে'র বদলে 'ঈসা' লেখা হচ্ছে। একইভাবে নামাজ-রোজার স্থানে এখন ছালাত-ছিয়াম চালু হয়ে গিয়েছে। নামায-রোযা ফার্সী শব্দ। যার অর্থ উপাসনা ও উপবাস। সকল ধর্মেই এগুলি আছে। তবে ইসলামে ছালাত ও ছিয়াম কেবল আল্লাহ্র উপরে ঈমান ও তাঁর নিকট থেকে পুরস্কার লাভের

উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এর জন্য শরী'আত নির্দেশিত বিশেষ সময় ও নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে। যা অন্য ধর্মের উপাসনা ও উপবাসের মধ্যে নেই। অতএব ইসলামের ছালাত ও ছিয়ামকে নামায ও রোযা দ্বারা অনুবাদ করা সঙ্গত নয়।

'ক্ষেত' বানান 'খেত' লেখা হচ্ছে। অথচ এদেশে সর্বদা 'ক্ষেত' শব্দটি শস্যক্ষেত অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। একইভাবে বহুল প্রচলিত শব্দ 'আবহাওয়া'কে 'জলবায়ু', 'ইতিমধ্যে'কে 'ইতোমধ্যে', 'ঐক্যমত'কে 'ঐকমত্য' 'রফতানী'কে 'রপ্তানি' বানিয়ে বিকৃতভাবে চালু করা হয়েছে। 'ক্ষেত' শব্দটি হিন্দী। যা উর্দূ ও বাংলা উভয় ভাষায় 'শস্যক্ষেত' অর্থে বহুল প্রচলিত। জানিনা এখন থেকে মেহমানকে দস্তরখানে 'খেতে' ডাকলে তিনি বাড়ীর পাশে বেগুন 'ক্ষেতে' চলে যাবেন কি না!

এক সময়ের বঙ্কিম-শরৎ বা রবীন্দ্র-নজরুলের বাংলা এখন অনেকটাই ম্রিয়মান। এটাই স্বাভাবিক। কেননা সমাজ জীবনে সংস্কারের গতিস্রোতের সাথে ভাষার গতিশীলতা অবিচ্ছেদ্য। এটি কোন ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ নয়। সরকারী আইন দিয়ে একে রুখতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। ভাষাকে তার গতির উপরে ছেড়ে দিতে হবে। শুধু দেখতে হবে যেন মূল অর্থ হারিয়ে বিপরীত অর্থে না যায়।

বস্তুতঃ বিদেশী শব্দের বাংলা বানানে উচ্চারণের বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যেটাকে আরবীতে 'ছিফাত' বা উচ্চারণভঙ্গি বলা হয়। যেমন ইংরেজীতে The (দি)-এর উচ্চারণ 'দ্যা'। Hour (হাওয়ার)-এর উচ্চারণ 'আওয়ার'। Honour (হনার)-এর উচ্চারণ 'অনার'। Sir (সির)-এর উচ্চারণ 'স্যার'। Desire (ডিসাইর)-এর উচ্চারণ 'ডিজায়ার'। Dictionary (ডিকটিওনারী)-এর উচ্চারণ 'ডিকশনারী'। Is (ইস)-এর উচ্চারণ 'ইজ'। Has (হ্যাস)-এর উচ্চারণ 'হ্যাজ'। এর ব্যতিক্রম উচ্চারণ করলে তা গৃহীত হবে না।

তাছাড়া বিদেশী শব্দকে সাধ্যমত তার 'মাখরাজ' বা উচ্চারণস্থলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলায় উচ্চারণ করা উচিত। যেমন ইণ্ডিয়া, ইংল্যাণ্ড, ফাউণ্ডেশন প্রভৃতি ইংরেজী শব্দের 'ণ্ড' নাসারন্ধ্র থেকে উচ্চারিত হওয়ার কারণে 'ন্ড' না বলে 'ণ্ড' দিয়ে বানান করা উত্তম।

আর আরবীতে 'মাখরাজ' ও 'ছিফাত' তথা উচ্চারণস্থল ও উচ্চারণভঙ্গির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। কেননা সেখানে ভুল হ'লে অর্থে ভুল হয়ে যায়। সেকারণ কুরআন-হাদীছ ও আরবী শব্দাবলীর অর্থ ঠিক রাখার জন্য আরবী হরফের মাখরাজ ও ছিফাত ঠিক রেখেই তার বাংলা বানান ঠিক করা আবশ্যক। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা বাংলা শব্দাবলীর একটা বানানরীতি নির্ধারণ করেছি। যদিও সেখানে বহুল প্রচলিত কিছু ব্যতিক্রমী বানান অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে।

বাংলা বানান সম্পর্কে
আমাদের গৃহীত প্রস্তাবনা ও মূলনীতি

বস্তুতঃ সাহিত্য অঙ্গনে সংস্কারের অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৯২ সালে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে তার সাথী এক ঝাঁক তরুণ লেখক ও সংগঠকের মাধ্যমে এ প্রচেষ্টা আরও গতি লাভ করেছে। আশা করি এটি ভবিষ্যতে আরও বেগবান হবে। এ যুগের বাংলা বিশুদ্ধ তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র প্রতিচ্ছবি হবে *ইনশাআল্লাহ*। নিম্নে আমাদের গৃহীত প্রস্তাবনা ও মূলনীতিসমূহ উল্লেখ করা হ'ল।

(১) বাংলাভাষা অবশ্যই আরবী-ফার্সী সহ অন্যান্য ভাষায় পুষ্ট ও সমৃদ্ধ থাকবে।

(২) যুগের চাহিদামতে বহু শব্দ বাতিল হবে, আবার বহু শব্দ তৈরী ও যুক্ত হবে। তাই দু'শ বছর পূর্বের বাংলায় ফিরে যাওয়ার চেষ্টা স্রেফ দুঃস্বপ্ন হবে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের চর্যাপদ ও ইউসুফ-জুলেখা মহাকাব্যের বাংলা আমাদের ইতিহাস হ'তে পারে। কিন্তু এ যুগে তা অনুসরণীয় নয়। তাই শুদ্ধিকরণের নামে পিছন দিকে ফিরানোর চেষ্টা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। বরং যিনি যতবেশী সহজ ও সাবলীলভাবে মানুষের মনের কথা মুখে বলতে পারবেন ও লিখতে পারবেন, তিনিই প্রকৃত সাহিত্যিক হিসাবে বরিত হবেন।

এদেশে এতদিন ব্রাহ্মণ্যবাদী ও পীরবাদী বাংলা প্রচলিত ছিল। বর্তমানে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন যতই এগিয়ে চলেছে, ততই অন্ততঃ ধর্মীয় অঙ্গনে বাংলা ভাষার গতি ও চরিত্র যথেষ্ট মাত্রায় পরিবর্তিত ও পরিশীলিত হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। আগে ঈশ্বর-ভগবান, ব্রাহ্মণ-যজমান, শ্রীশ্রী শ্রীযুক্ত,

মহাত্মন-মহামহোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে ভরা থাকত। এখন এগুলো খুঁজতে রীতিমত বেগ পেতে হবে। আগে মুসলমানী বাংলা নমাজ-রোজা, খোদা-খোদাবক্স, পীর-আউলিয়া, মাস্তান-দিওয়ানা, গুরু-মুর্শিদ, মুন্সী-মৌলভী ও সাধু-দরবেশে ভরা থাকত। এখন তা ছালাত-ছিয়াম, আল্লাহ-রাসূল, আলেম-ওলামা ও মাওলানায় পরিবর্তিত হয়ে গেছে। প্রবাদ-উপমা-উৎপ্রেক্ষার ব্যবহারে কুফরী সংস্কৃতি থেকে মানুষ ক্রমেই সচেতন হচ্ছে। এর মাধ্যমে আগামী দিনের গবেষকরা বুঝতে পারবেন, এ যুগের বাংলাভাষীরা কোন আদর্শের অনুসারী ছিলেন। ফলে এ যুগের বাংলা তার ভাষাভাষীদের লালিত আক্বীদা ও আমলের প্রতিনিধিত্ব করবে। ঠিক যেমন প্রাচীন আরবী কবিতাকে 'দীওয়ানুল আরব' বা 'আরবী ভাষার রেজিস্টার' বলা হয়। কারণ তা জাহেলী আরবের ভাষা এবং তাদের সমাজ ও সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করে। তাই সাহিত্য সমাজের আয়না স্বরূপ। আর সাহিত্যের মাধ্যমেই প্রকৃত অর্থে সমাজে বিপ্লব সৃষ্টি হয়। আমরা আমাদের বক্তৃতা ও লেখনীকে যত বেশী শিরক ও বিদ'আতী শব্দ থেকে মুক্ত করতে পারব, এদেশের সাহিত্য অঙ্গন ততবেশী তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে সুশোভিত হবে। তাতে এদেশের মানুষের যবান ও কলম থেকে জাহেলিয়াতের অন্ধকার দূরীভূত হবে। দেশে আল্লাহ্র রহমতের ফল্গুধারা প্রবাহিত হবে।

(৩) বাংলা শব্দগুলি যে ভাষা থেকে এসেছে, সেই ভাষার উৎসমূলের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। বিশেষতঃ আরবী ভাষার ক্ষেত্রে এই রীতি অবলম্বন করা হবে। কারণ আরবী সকল ভাষার মা।

(৪) বর্তমান ও আদেশসূচক ক্রিয়ার শেষে ও-কার থাকবে। যেমন চলো, বলো, করো ইত্যাদি। তবে সাধারণভাবে ও-কার হবে না। যেমন চল, বল, কর, গেল, ছিল, খাব, করল, ধরল, মারল, লিখব, পড়ব ইত্যাদি।

(৫) সাধু ভাষায় হইতে, হইত, হইলে, হইল, দিব ইত্যাদি শব্দ চলিত বানানে হ'তে, হ'ত, হ'লে, হ'ল, দেব হবে। আর এটাই বর্তমানে প্রচলিত। যদিও অনেকে শেষে ও-কার দেওয়াটা পসন্দ করেন।

(৬) সকল ভাষার ন্যায় বাংলা ভাষাতেও কিছু রীতি বিরুদ্ধ শব্দ থাকবে, যেগুলি সর্বাধিক প্রচলিত। তবে অভিধানে তার ব্যাখ্যা থাকতে হবে। তাকে

বিকৃত করা যাবে না। যেমন 'হক' মূল আরবী উচ্চারণ হক্ব (حق)। 'কিয়ামত' মূল উচ্চারণ 'ক্বিয়ামত' (قيامت، قيامة)। 'জিলা' বানান ভুল। কেননা এর মূল উচ্চারণ 'যেলা' (ضلع) অর্থ 'দেহের পার্শ্বদেশ'। সেখান থেকে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পার্শ্বদেশ। 'যশোর' বাংলা বানান ভুল। কেননা এর মূল উচ্চারণ 'জসর' (جسر) অর্থ 'পুল'। এক্ষেত্রে ইংরেজী বানান Jessore সঠিক। কেননা 'জ' কে ইংরেজীতে J দিয়ে উচ্চারণ করা হয়। 'গাজী' মূল উচ্চারণ 'গাযী' (غازى) অর্থ 'আল্লাহ্র পথে লড়াইয়ে জীবিত মুমিন'। বাংলা 'গাজী' বানান ভুল। কিন্তু ইংরেজী GAZI বানান সঠিক। 'হাউজ' মূল উচ্চারণ 'হাউয' (حوض)। বাংলা 'হাউজ' বানান ভুল।

(৭) বাংলা সম্বন্ধপদে এদেশে ফার্সী সম্বন্ধপদটাই চালু। অতএব সেটাই ঠিক রাখা ভাল। আরবী সম্বন্ধপদ কথ্য বাংলায় বেমানান। যেমন ফার্সী সম্বন্ধ পদে 'আলে ইমরান'। এটাকে আরবী সম্বন্ধপদে 'আলু ইমরান' বলার কোন প্রয়োজন নেই। তাছাড়া 'আলু' একটি সবজির নাম। 'আল-ইমরান' তো আদৌ বলা যাবে না। তাতে অর্থের পরিবর্তন ঘটবে। 'আয়েশা বিনতে আবুবকর' নামটি প্রচলিত। একে আরবী উচ্চারণে 'আয়েশাহ বিনতু আবী বকর' বলার প্রয়োজন নেই। কারণ আরবী যৌগিক শব্দ আরবী বাক্যে মানানসই। কিন্তু কথ্য বাংলায় বেমানান ও কঠিন বটে।

আরবী ইবন (ابن) শব্দটি আরবী সম্বন্ধপদে বাংলায় 'ইবনু' এবং ফার্সী সম্বন্ধপদে বাংলায় 'ইবনে' বা 'ই' বিলুপ্ত করে 'বিন' শব্দে প্রচলিত। যেমন আরবী সম্বন্ধপদে 'ইবনু ওমর'। ফার্সী সম্বন্ধপদে 'ইবনে ওমর'। 'ই' বিলুপ্ত করে 'বিন' শব্দে যেমন 'মু'আয বিন জাবাল' 'মুহাম্মাদ বিন তুঘলক' প্রভৃতি। এগুলিকে অহেতুক 'ইবন' বানানোর কসরত করার কোন প্রয়োজন নেই। একইভাবে ফার্সী সম্বন্ধপদে 'আহলেহাদীছ'-কে বাংলায় আরবী সম্বন্ধপদে 'আহলুল হাদীছ' বলার কোন প্রয়োজন নেই।

আরবী যৌগিক শব্দগুলির প্রচলিত ইংরেজী বানান একেবারেই বেমানান ও অপাঠ্য। বরং মূল থেকে বিচ্যুত। যেমন 'আব্দুল্লাহ' বানান ইংরেজীতে Abd

Allah. অর্থাৎ বান্দা নিজেই আল্লাহ (নাঊযুবিল্লাহ)। 'রফীকুল ইসলাম' Rafeeq Al-Islam. এটাকেই গ্রন্থপঞ্জীতে লিখলে তখন হবে Islam Al-Rafeeq. এক কথায় পুরা নামটারই বিকৃতি। 'রাসূলুল্লাহ' বানান ইংরেজীতে Rasool Allah. গ্রন্থপঞ্জীতে লিখলে তখন হবে Allah Rasool. যা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। অনেকে লিখেন ইনাম-উল-হক, ইয়াজ-উদ-দীন, রাইছ-উদ-দীন। যা বানানে ও আরবী সম্বন্ধ পদে একেবারেই ভুল।

'ইবনুল আছীর'-এর ইংরেজী বানান Ibn Al-Atheer. এখনকার অনেকে বাংলা উচ্চারণ লিখছেন ইবন আছীর, ইবন কাছীর, ইবন ওমর, ইবন মাসউদ প্রভৃতি। ভাবখানা এই যে, ইব্ন শব্দটি গায়ের মুনছারিফ যা অপরিবর্তনীয়। ওটাকে ইবনু কাছীর বা ইবনে কাছীর বলা চলবে না।

মূলতঃ এগুলি স্রেফ ইংরেজী বানানের অনুকরণ। যা মূল আরবীর মাখরাজ ও ছিফাতকে ধ্বংস করে দেয়। অথচ মূল আরবী উচ্চারণ ঠিক রেখেই বাংলা উচ্চারণ করতে হবে। যদিও ক্ষেত্র বিশেষে ব্যতিক্রম ঘটবে।

(৮) আরবী-ফার্সী থেকে বাংলা প্রতিবর্ণায়নে মাখরাজ ও ছিফাতের দিকে খেয়াল রেখে আমাদের প্রস্তাবিত বানানরীতি নিম্নরূপ।-

আরবী হরফ	উচ্চারণ	বাংলা হরফ/চিহ্ন	উদাহরণ	
			বাংলা	আরবী
أ ء	হামযাহ	’	মা’কূল	مَأْكُوْلٌ
ع	আয়েন	‘	মা‘বূদ	مَعْبُوْدٌ
ط	ত্বোয়া	ত্ব	ত্বা-লূত	طَالُوْتُ
ث ص	ছা, ছোয়াদ	ছ	ছালা-ছাতুন, ছালা-তুন	ثَلاَثَةٌ، صَلاَةٌ
س	সীন	স	সালা-মুন	سَلاَمٌ

ذ ز ض ظ	যাল, ঝা, যোয়াদ, যোয়া	য	যা-লেকা, ঝাওজুন, যালা-লাতুন, যামাউন	ذَالِكَ، زَوْجٌ، ضَلاَلَةٌ، ظَمَأٌ
ج	জীম	জ	জুম'আতুন	جُمْعَةٌ
ق	বড় ক্বাফ	ক্ব	ক্বাবাসুন	قَبَسٌ
و	ওয়াও	ঊ, ু	মা-'ঊন, লাহূ	مَاعُوْنٌ، لَهُ
ا	আলিফ	-	ইইয়া-কা	إِيَّاكَ
ى	ইয়া	ঈ, ি	না'ঈম, রহীম	نعيم، رَحِيْمٌ

(৯) হ্রস্ব ইকার ও দীর্ঘ ঈকার যথাযথভাবে লিখিত হবে আরবী-উর্দূ শব্দের বানানের দিকে লক্ষ্য রেখে। যেমন ইয়া মা'রূফ দিয়ে 'আরবী' (عربى)-র বাংলা উচ্চারণ 'আরবী' হবে, 'আরবি' নয়। 'ইসলামী' (اسلامى)-এর বাংলা উচ্চারণ ইসলামী হবে, 'ইসলামি' নয়। 'রহীম' (رحيم)-এর বাংলা উচ্চারণ 'রহিম' নয়। কারণ তাহ'লে দীর্ঘ ঈকার পরিবর্তিত হয়ে হ্রস্ব ইকার হয়ে যাবে এবং তাতে অর্থের পরিবর্তন ঘটবে। যেমন 'রহীম' আল্লাহ্র গুণবাচক নাম। যার অর্থ অসীম দয়ালু। পক্ষান্তরে 'রহিম' (رَحِم) অর্থ 'গর্ভাশয়'। বড় ক্বাফ দিয়ে قَلَم অর্থ কলম। আর ছোট কাফ দিয়ে كَلْم অর্থ যখম বা ক্ষত।

(১০) শব্দের মাখরাজ বা উচ্চারণস্থলের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। বিশেষতঃ ইসলামী মূল পরিভাষাগত শব্দ সমূহের প্রতি। নইলে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাবে। যেমন ওযূ (وضو), হযরত (حضرت), খিযির (خضر), যোহর (ظهر), রামাযান (رمضان), হুযূর (حضور), ফযল (فضل), যবহ (ذبح), আযীয (عزيز), রিযিক (رزق), নযর (نظر), হযম (هضم) ইত্যাদি

শব্দগুলির সবই ছিফাতে লাযেমাহ জাহরের অন্তর্ভুক্ত। সবগুলির মাখরাজ ও ছিফাত কাছাকাছি। এগুলি পরিবর্তন করে উজু, হজরত, খিজির, জোহর, রমজান বা রামাদান, হুজুর, ফজল, জবহ, আজীজ, রিজিক, নজর, হজম বলা যাবে না। কারণ তখন এগুলির মাখরাজ পরিবর্তন হয়ে যাবে। অর্থেরও পরিবর্তন হবে। যেমন ‘হযম’ (هضم) অর্থ ‘খাদ্য হযম করা’। কিন্তু হজম (هجم) অর্থ ‘হামলা করা’ ইত্যাদি। এদেশে ‘হযম করা’ অর্থে প্রচলিত। অতএব তার বানান ‘হযম’ হবে। হজম বা হদম নয়। যেমন ‘রামাযান’ বিশুদ্ধ ও প্রচলিত শব্দ। একে রামাদান বা রমাদ্বান বলার কোন প্রয়োজন নেই।

(১১) ص বাংলায় ‘ছ’ হবে। কারণ এটি ছিফাতে মুতাযাদ্দাহ হাম্স-এর অন্তর্ভুক্ত। যার ক্ষীণ আওয়ায জারি থাকে। তাছাড়া ص-এর শেষাংশ কেটে দিলে صـــ থাকে। যা ছ-এর আকৃতির কাছাকাছি। যেমন ছালাত (صلاة), ছিয়াম (صيام), ছাদাক্বা (صدقة) ইত্যাদি। এগুলির বানান সালাত বা স্বলাত, সিয়াম, সাদাকা লেখা ভুল হবে। যেমন ছালাওয়াত (صلوات) অর্থ ‘ছালাত সমূহ’। কিন্তু সালওয়াত (سلوات) অর্থ ‘তিতির জাতীয় এক প্রকার পাখি’।

ث বাংলায় ‘ছ’ হবে। কারণ ص ও ث-এর ধ্বনি বা ছিফাত একই। দু’টিই ছিফাতে মুতাযাদ্দাহ হাম্স-এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন حديث-এর উচ্চারণ ‘হাদীছ’ হবে। যার অর্থ বাণী। হাদিছ, হাদিস বা হাদীস নয়। কেননা তখন ছিফাত ঠিক থাকলেও মাখরাজ ও অর্থ দু’টিরই পরিবর্তন হবে। যেমন হাদিছ (حادث) অর্থ নবোদ্ভূত, হাদিস (حادس) অর্থ ধারণাকারী। আর ‘হাদীস’ (حديس) অর্থ ‘ধরাশায়ী’। ফলে হাদীছ-এর মূল অর্থ ও মর্ম বিকৃত হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, اَللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ، ‘আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী নাযিল করেছেন’ *(যুমার-মাক্কী ৩৯/২৩)* অর্থ কুরআন।

س বাংলায় 'স' হবে। কারণ س-এর শেষাংশ কেটে দিলে ـــ থাকে। যা 'স' বা ـــ-এর ন্যায়। যেমন আস্ত, রাস্তা, অবস্থা, ব্যস্ত। س-এর উচ্চারণস্থল এবং 'স'-এর উচ্চারণস্থল একই। যেমন সালাম, ইসলাম, সিজদা, তাফসীর ইত্যাদি। 'সালাম' এর বানান 'ছালাম' হবে না। কেননা এর মূল হ'ল سلام যা সীন দিয়ে লিখিত। পক্ষান্তরে 'ছালাম' (صَلَمٌ) অর্থ 'মযবুত'। যাতে সালাম-এর অর্থ বিকৃত হয়ে যায়। যার অর্থ 'শান্তি'।

ذ ز ض ظ বাংলায় 'য' হবে। কারণ চারটিই ছিফাতে মুতাযাদ্দাহ জাহ্র-এর অন্তর্ভুক্ত। যদিও তাদের মাখরাজ পৃথক। যেমন যিকর (ذكر), যাকাত (زكاة), যরূরী (ضرورى), যুলুম (ظلم) ইত্যাদি। এগুলির বানান জিকির, জাকাত, জরুরী, জুলুম লেখা ভুল হবে।

ط বাংলায় 'ত্ব' হবে। কারণ আরবী 'তা' থেকে পৃথক করার জন্য বাংলায় কোন হরফ নেই। সেকারণ বাংলার ব ফলা-কে ত-এর নীচে যোগ করে ط উচ্চারণ করতে হবে। যেমন ত্বাহারৎ (পবিত্রতা), ত্বোয়াহা (সূরার নাম)। একইভাবে বড় ক্বাফ (ق) উচ্চারণ 'ক্ব' হবে। যেমন ক্বালাম (قلم), ফক্বীর (فقير), ক্ববয (قبض), হক্ব (حق), ক্বর্য (قرض) ইত্যাদি। কিন্তু এগুলি ছোট কাফ হিসাবে বহুল প্রচলিত। অর্থাৎ কলম, ফকীর, কবয, হক, কর্য ইত্যাদি। সেভাবেই লেখা ভাল হবে। 'কব্জা' আসলে ছিল 'ক্ববযাহ' (قبضه)। কিন্তু এটি 'য'-এর স্থলে 'জীম' উচ্চারণে প্রচলিত। অতএব 'কব্জা' বানান লেখাই উত্তম হবে। একইভাবে 'আসল'-এর মূল উচ্চারণ 'আছ্ল' (أصل)। কিন্তু এটি 'ছ-দ'-এর স্থলে 'সীন' উচ্চারণে প্রচলিত। অতএব 'আসল' বানান লেখাই উত্তম হবে। একইভাবে তালাক-এর মূল উচ্চারণ 'ত্বালাক্ব' (طلاق)। কিন্তু এটি তালাক উচ্চারণে প্রচলিত। অতএব সেটা রাখাই ভাল হবে।

(১২) কিছু নামের বানানে রয়েছে আরবীর বিকৃত উচ্চারণ। যেমন 'নগদ'। যার আসল উচ্চারণ হবে 'নক্বদ' (نقد)। কিন্তু সেটি প্রচলিত নয়। অতএব 'নগদ'টাই মেনে নিতে হবে। তবে আসল উচ্চারণটা জানতে হবে। 'যবাই' আসল উচ্চারণ 'যবহ' (ذبح)। 'রিযিক' আসল উচ্চারণ 'রিয্ক্ব (رزق), 'মামলা' আসল উচ্চারণ 'মু'আমালাহ' (معاملة), 'সদর' আসল উচ্চারণ 'ছদর' (صدر)। এসব ক্ষেত্রে প্রচলিত বানানই থাকবে। এভাবে সাধারণ আরবী শব্দের বাংলা বিবর্তিত রূপের ক্ষেত্রে প্রচলিত রূপকেই অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

(১৩) ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ (ইফাবা)-এর বানান রীতির অনুসরণে ইসলামী বিশ্বকোষ ১ম খণ্ড থেকে একটি উদ্ধৃতি :

(ক) 'আব্বাস ইব্ন 'আবদিল- মুত্ তালিব

কুনয়াত আবুল-ফাদ্ল, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পিতা 'আবদুল্লাহ্র বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তাঁদের মাতা ছিলেন আন্-নামির গোত্রের নুতায়লাঃ বিন্ত জানাাব।[৪]

উক্ত উদ্ধৃতিটি 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' (হাফাবা)-এর বানানরীতি অনুযায়ী হবে-

আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব। কুনিয়াত আবুল ফযল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতা আব্দুল্লাহ্র বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তাঁর মাতা ছিলেন আন-নামির গোত্রের নুতায়লা বিনতে জানাব'। পুরা নাম أبو الفضل عباس بن عبد المطلب، أمه : نتيلة بنت جناب بن كليب النمرية، زوجة عبد المطلب-

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত বিশ্বকোষের বর্ণনায় 'তাঁদের মাতা' লেখা হয়েছে। অথচ আব্দুল্লাহ ও আব্বাসের মাতা পৃথক ছিলেন। আব্দুল্লাহ্র মাতা ছিলেন 'ফাতেমা' এবং আব্বাসের মাতা ছিলেন 'নুতায়লা'।

৪. ইসলামী বিশ্বকোষ ১/৬৩৩, প্রকাশকাল : ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খৃ.।

(খ) 'আইশা বিন্ত আবী বাক্র (রা), 'আইশা বিন্ত ত ালহ া (র)।

এক্ষেত্রে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' (হাফাবা)-এর বানানরীতি হ'ল আয়েশা বিনতে আবুবকর (রাঃ), আয়েশা বিনতে তালহা (রহঃ)।

সচেতন পাঠকই বলবেন, উপরে প্রদত্ত তিনটি নামের কোনটির উচ্চারণ সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ। হাফাবা-এর উচ্চারণই সঠিক হবে। কারণ আরবী শব্দের যথাযথ উচ্চারণ আরবী বাক্যেই সম্ভব এবং সেটি অপরিহার্য। কিন্তু বাংলায় বা অন্য কোন ভাষায় নয়।

বস্তুতঃ ভাষা আল্লাহ্র সৃষ্টি। এর নিত্য নতুন বৈচিত্র্যটাও আল্লাহ্র সৃষ্টি। তাই বেদের শ্লোক ইত্যাদির উৎস সন্ধান করা এবং বর্তমান বাংলা ভাষাকে পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে শুদ্ধ করার চেষ্টা স্রেফ পণ্ডশ্রম মাত্র। বরং ভাষাকে নিত্য নতুন বৈচিত্র্য যোগে সমৃদ্ধ করাই উত্তম। যেমন অতি সম্প্রতি বাংলায় চালু হয়েছে মিস করা, মিন করা, মাইণ্ড করা, লাইক করা, করোনা, ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট, ভাইরাস, লাইভ, ফলো করা, কমেন্ট করা, শেয়ার করা, সাবস্ক্রাইব করা, ভিউ, ভাইরাল, ট্রল, ফ্যান, টাইমলাইন, ওয়াশরুম, ইমোজি, মেনশন, টেনশন, ওয়েবিনার ইত্যাদি শব্দ সমূহ।

উপসংহার :

ইসলামী বাংলার বানানের ক্ষেত্রে বিগত একশ' বছরের মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। যেমন আগে বলা হ'ত এমাম, এছলাম, মোছলেম, মুছলিম, ছালাম, নমাজ, রোজা ইত্যাদি। এখন তা পরিবর্তিত হয়ে লেখা হচ্ছে, ইমাম, ইসলাম, মুসলিম, সালাম, ছালাত, ছিয়াম ইত্যাদি। এরূপ পরিবর্তনের কারণও রয়েছে। যা উপরে আমাদের আলোচনায় বিস্ত ারিতভাবে এসেছে। কিছু শব্দ রয়েছে যা আরবী-ফার্সীর উচ্চারণ বিধি অনুযায়ী ই-কার হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ছিফাত বা উচ্চারণস্থল অনুযায়ী সেখানে এ-কার বলা হয়। যেমন কেতাব, কেচ্ছা, ফেকাহ, ফেরকা, ছাবেত, সালেম, আমের, খাহেশ, ফাহেশা, ক্বায়েদা, ফায়েদা, ফেৎরা প্রভৃতি শব্দ। একইভাবে উ-কারের স্থলে ও-কার উচ্চারণ হয়। যেমন ওমর, ওছমান, ওবায়দা, ওবায়দুল্লাহ, ওযর, ওশর, তোহর, দোকান ইত্যাদি।

এসব পরিবর্তনের মাধ্যমে শব্দের মূল অর্থের পরিবর্তন হয়নি। অতএব এগুলি মেনে নিতে হবে।

বানানের ক্ষেত্রে ক্রমবিবর্তনের উদাহরণ স্বরূপ (১) 'কুরআন শরীফ' বানান বাংলা ১৩১৬ সালে (১৩২৭ হি./১৯০৯ খৃ.) ছিল 'কোরাণ-শরিফ' *(প্রণেতা : মৌলবী মোহাম্মাদ আব্বাছ আলি)*। একই বানান বাংলা ১৩৬৫ সালে (১৩৭৭ হি./১৯৫৮ খৃ.) ছিল কৌর্আন শ'রীফ *(প্রণেতা : মোহাম্মদ আকরম খাঁ, তাফ্ছীরুল কৌর্আন শ'রীফ (ঝিনুক পুস্তিকা (ঢাকা-১, ১ম সংস্করণ) : ১ম খণ্ড, রামাজান, ১৩৭৮)*।

(২) 'আহলেহাদীছ' নামের বানান বাংলা ১৩৩২ সালে (১৩৪৩ হি./১৯২৫ খৃ.) ছিল 'আহলেহাদিস' *(মাসিক আহলেহাদিস, কলিকাতা, ১১শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ সংখ্যা ১৩৩২ সাল)*। বাংলা ১৩৫৫ সাল মোতাবেক অক্টোবর ১৯৪৮ সালে বানান ছিল 'আহলেহাদিছ' *(জমঈয়তে আহলেহাদিছের ১ম গঠনতন্ত্র, ছোট সাইজ, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬)*। বাংলা ১৩৬৪ সাল মোতাবেক ১৯৫৭ সালের ২য় গঠনতন্ত্রে ছিল 'আহলেহাদীছ' *(প্রমাণ সাইজ, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮)*।

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ১৯৪৯ সালে মাসিক তর্জুমানুল হাদীছের বানান ছিল, 'তর্জুমানুল হাদিছ'। অতঃপর ২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা জুন ১৯৫১ থেকে বানান লেখা শুরু হয়, 'তর্জুমানুল হাদীছ'। যা ১৬তম বর্ষ নভেম্বর ১৯৭০ সালে পত্রিকা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বর্তমানে পুনরায়

প্রকাশিত উক্ত পত্রিকার নাম হয়েছে 'তর্জুমানুল হাদীস' *(৪র্থ বর্ষ ১২তম সংখ্যা মার্চ ২০২২; প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহঃ)*। যদিও প্রতিষ্ঠাতার সর্বশেষ গৃহীত বানান ছিল 'তর্জুমানুল হাদীছ'।

১৩৬৭ মোতাবেক ১৯৬০ সালে জমঈয়তে আহলেহাদীছের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফীর মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল বারীর সভাপতিত্বকালে ২য় গঠনতন্ত্রের 'আহলেহাদীছ' বানান পরিবর্তন করে বাংলা ১৩৮৬ মোতাবেক ১৯৮০ সালে গঠনতন্ত্রের ৩য় সংস্করণে বানান লেখা হয় 'আহলেহাদীস'। যা এখনো আছে।

পক্ষান্তরে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র বানান ১৯৭৮ সাল থেকে অদ্যাবধি (২০২২) একই বানান রয়েছে 'আহলেহাদীছ'।

(৩) 'মুহাম্মাদী' বানান বাংলা ১৩৩৪ সালে (১৩৪৫ হি./১৯২৭ খৃ.) ছিল 'মোহাম্মদী' *(১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাসিক মোহাম্মদী, বাংলা কার্ত্তিক ১৩৩৪ সাল)*।

(৪) 'অহি' বানান অনেকে লেখেন 'ওয়াহী' 'ওয়াহি' 'অহী'। কিন্তু অহি-র আরবী বানানের শেষে ইয়ায়ে মা'রূফ থাকলেও তার পূর্বে হা-সাকিন আছে (وَحْيٌ)। সেহেতু এখানে ইয়ায়ে মা'রূফের টান হবেনা। ফলে এর সঠিক উচ্চারণ হবে 'অহি'। আর 'অহি' বানান করেছেন মুসলিম বাংলার পুরোধা সাহিত্যিক ও বাংলায় কুরআনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদক মৌলবী আব্বাছ আলি *(আহযাব ২ আয়াত, পৃ. ৬৭৩)*। একই বানান লিখেছেন আরেকজন দিকপাল, মুসলিম সাংবাদিকতার জনক মোহাম্মদ আকরম খাঁ *(আন'আম ৫০ আয়াত)*। তবে মৌলবী আব্বাছ আলি অন্যস্থানে 'অহী' লিখেছেন। আবার 'দ্বীন' বানান লিখেছেন, 'দিন' (ধর্ম্ম)।[৫] আমরা বিদেশী শব্দের উৎসমূল এবং উচ্চারণস্থলের দিকে লক্ষ্য রেখে হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর বানানরীতি নির্ধারণ করেছি।

আল্লাহ আমাদের মাতৃভাষাকে সকল প্রকার অনৈসলামী মিশ্রণ ও অন্যদের অপতৎপরতা হ'তে মুক্ত রাখুন এবং আমাদেরকে নিজ মাতৃভাষায় যথাযথভাবে বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার ও প্রসারের তাওফীক দান করুন- আমীন!

৫. মৌলবী মোহাম্মাদ আব্বাছ আলি, কোরাণ-শরিফ (কলিকাতা : আলতাফী প্রেস ১৩১৬ বঙ্গাব্দ), বড় সাইজ, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৭৫, আহযাব ৫ আয়াত, পৃ. ৬৭৪।